‘সংসদ সদস্য পদ টিকিয়ে রাখার জন্য সংসদে যাচ্ছি না...’

সাবের হোসেন চৌধুরী

mvsMVwbK m¤úv`K, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

সাবের হোসেন চৌধুরী। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও বিরোধীদলীয় নেত্রীর রাজনৈতিক সচিব। তুলনামূলকভাবে স্বচ্ছ রাজনীতিক হিসেবে তার রয়েছে বিশেষ গ্রহণযোগ্যতা। ব্যক্তিগত জীবনে একজন সফল ব্যবসায়ী থেকে আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে এসেও সফলতা পেয়েছেন। দলের নীতিনির্ধারণে এখন তার প্রভাব রয়েছে বলে মনে করা হয়। চলমান রাজনীতির নানা বিষয় নিয়ে তিনি সম্প্রতি সাপ্তাহিক ২০০০-এর মুখোমুখি হয়েছিলেন। তার সাক্ষাৎকার নিয়েছেন... **খোন্দকার তাজউদ্দিন**

সাপ্তাহিক ২০০০ : দেশের সার্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি এখন কেমন বলে মনে করেন?

সাবের হোসেন চৌধুরী : আমি মনে করি, রাজনৈতিক পরিস্থিতি বেশ জটিল। এই জটিলতা আগের চেয়ে অনেক বাড়বে। কেননা, সবাই এখন নির্বাচনের বিষয়টা বিবেচনা করছে। সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য যে সুষ্ঠু পরিবেশের প্রয়োজন দেশে এখন তা নেই। বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার ‘ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং’-এর মাধ্যমে একটি অপকৌশলের নাটক সাজিয়েছে। ঐ নাটকে অংশগ্রহণ করার ইচ্ছা আমাদের নেই। ফলে সমঝোতা হবার সম্ভাবনাটা দিন দিন ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। এ ছাড়া দেশে অন্যান্য যে সমস্যা দেখা দিয়েছে, তা পরিস্থিতিকে আরো জটিল করবে। যেমন-দ্রব্যমূল্য দিন দিন লাগামহীনভাবে বেড়েই চলেছে। জঙ্গিদের ক্ষেত্রে জামায়াতের সম্পৃক্ততা স্পষ্ট হয়ে গেছে। এসব বিষয় রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে আরো উত্তপ্ত করে তুলেছে। যারা বাংলাদেশ নিয়ে ভাবেন, দেশের মঙ্গল চান, তারা এখন বেশ উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যে আছেন।

২০০০ : আওয়ামী লীগ দীর্ঘদিন পর সংসদে ফিরছে। বিষয়টি আপনি কীভাবে দেখছেন?

সাবের : গঠনমূলকভাবেই দেখছি। কারণ, আওয়ামী লীগ যে সব সময় ইতিবাচক রাজনীতি করে এটা তারই প্রমাণ। সংসদে আমরা ফিরছি ঠিকই, কিন্তু কেন ফিরছি সেটা মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয়া উচিত। সাবেক অর্থমন্ত্রী কিবরিয়া সাহেব ও সাংসদ আহসানউল্লাহ মাস্টারের হত্যাকান্ডের পর যখন ক্ষমতাসীন জোট এ বিষয়ে সংসদে আলোচনা করতে দিল না, তখন আমরা বেরিয়ে এসেছি। সংসদের ইংরেজি প্রতিশব্দ পার্লামেন্ট, এটা এসেছে ‘পার্লে’ শব্দ থেকে। যার অর্থ কথা বলা। মূল যে বিষয় কথা বলার সুযোগ, সেটা যদি না থাকে তাহলে সংসদে অংশগ্রহণ

> জামায়াতের জঙ্গি কানেকশন আজ প্রতিষ্ঠিত সত্য। যারা জামায়াতকে উৎসাহিত করছে তারা সরকারের ভেতরেই আছে। আমি মনে করি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ হাওয়া ভবন ও তারেক জিয়া সরাসরি এতে জড়িত। তাদের গ্রিন সিগন্যাল ছাড়া বাংলাদেশে এভাবে একের পর এক ঘটনা ঘটতে পারে না

সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য যে সুষ্ঠু পরিবেশের প্রয়োজন দেশে এখন তা নেই। বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার 'ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং'-এর মাধ্যমে একটি অপকৌশলের নাটক সাজিয়েছে। ঐ নাটকে অংশগ্রহণ করার ইচ্ছা আমাদের নেই। ফলে সমঝোতা হবার সম্ভাবনাটা দিন দিন ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে

অনেকটা অর্থহীন হয়ে পড়ে। তবে আমরা মনে করি, এখন বাংলাদেশের রাজনীতি যে পর্যায়ে এসেছে, আমাদের যে সংস্কারের প্রস্তাব তা পেশ করার পাশাপাশি বিগত প্রায় ৫ বছরের বিভিন্ন ঘটনাবলী ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা, সংসদের রেকর্ডে অন্তর্ভুক্ত করা- বিষয়গুলো আমরা গঠনমূলকভাবে দেখছি। এগুলো জাতির সামনে তুলে ধরা আমাদের একটি দায়িত্ব বলে মনে করি।

২০০০ : আওয়ামী লীগের এই সংসদে যাওয়াটা শুধু সংসদ সদস্যপদ রক্ষার জন্য যাওয়া, নাকি সংসদীয় গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য?

সাবের : সংসদ সদস্যপদ টিকিয়ে রাখার জন্য সংসদে hw”Q না। এটাই যদি মূল উদ্দেশ্য হতো, তাহলে লংমার্চের পর ঢাকায় যে কর্মসূচি হলো সেখানে নেত্রী যে কথাটি বলেছেন, সংস্কার প্রস্তাব যদি না মানা হয় তাহলে আমরা সংসদ থেকে পদত্যাগ করার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে আসব। নেত্রীর এসব কথা থেকে বোঝা যায়, এটা আসন টিকিয়ে রাখার কোনো বিষয় নয়। এই সংসদে গেলেই যে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাবে সেটাই মূখ্য বিষয় নয়। তবে আমরা মনে করি, বিরোধী দল হিসেবে দেশের মানুষের প্রত্যাশা মেটাতে আমাদের যতটুকু করণীয়, সেটা আমরা করছি।

২০০০ : দীর্ঘদিন সংসদে যাননি, অথচ আপনারা বলছেন, সরকার সংসদে কথা বলতে দেয় না। আপনারা সংসদ সদস্য হিসেবে সব সুযোগ-সুবিধাও ভোগ করেন। এটা কতটুকু নৈতিক বলে মনে করেন?

সাবের : আমরা যদি সংসদকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতাম এবং সংসদের কোনো কর্মকান্ডের সঙ্গে ন্যূনতম সম্পৃক্ততা না থাকতো তাহলে আমি আপনার সঙ্গে একমত হতাম যে, নৈতিক দিক থেকে এটা গ্রহণযোগ্য নয়। এটা এক ধরনের 'ডবল স্ট্যান্ডার্ড' বা এক ধরনের ভন্ডামি। সংসদের নানা দিক আছে, নানা মাত্রা আছে। এর একটি হচ্ছে মন্ত্রণালয়ভিত্তিক সংসদীয় কমিটি। এসব কমিটির যে সভা হয়, সেখানে আমরা নিয়মিত যোগ দিচ্ছি। সুতরাং যে কথা উঠেছে, আমরা সংসদ বর্জন করছি- এটা ঠিক নয়। সংসদের যে প্রশ্ন-উত্তর পর্ব বা অধিবেশন হয় এবং টেলিভিশনের পর্দায় দেখানো হয়, সেটাতে আমরা যাচ্ছি না।

২০০০ : আপনাদের সর্বশেষ রাজনৈতিক কর্মসূচি ছিল লংমার্চ। এ কর্মসূচি কতটুকু সফল হয়েছে বলে মনে করেন?

সাবের : সফলতার বিচার করতে হলে এটার উদ্দেশ্য কি ছিল সেই আলোকে বিবেচনা করতে হবে। নতুন নির্বাচন কমিশনার ও উপজেলা নির্বাচনী কর্মকর্তা নিয়োগ দলীয় দৃষ্টিভঙ্গিতেই করা হয়েছে। সরকার যেহেতু সব ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে সেহেতু তারা কোনোভাবেই চাইবে না, নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হোক, সুষ্ঠু হোক। এ কথাটা আমরা দেশের মানুষকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছি। কেননা, এই লংমার্চ সমগ্র বাংলাদেশকে সম্পৃক্ত করেছে। দেশের প্রতিটি জেলায়, প্রতিটি থানায় আমাদের কর্মসূচি হয়েছে। গণসংযোগের দিক থেকে এটা একটা বিশাল সফলতা। পাশাপাশি এই কর্মসূচির মাধ্যমে সাংগঠনিক মোবিলাইজেশন বা গতিশীলতার ক্ষেত্রেও আমরা বিরাট সাড়া পেয়েছি। এ বিষয়ে আমরা খুবই সন্তুষ্ট।

২০০০ : লংমার্চ শেষে সমাবেশ থেকে দলীয় সভানেত্রী সংসদে যাবার ঘোষণা দেন। আবার সংসদে আপনাদের কথা না শুনলে একযোগে পদত্যাগ করার হুমকি দেন। এ সম্পর্কে বলুন।

সাবের : এই হুমকি শতভাগ যৌক্তিক। কেননা, উনি যে সংস্কার প্রস্তাব দিয়েছেন তাতে বিশেষ কোনো রাজনৈতিক দলকে বিশেষ কোনো সুবিধা দেয়া হচ্ছে না। এ সংস্কার প্রস্তাবের মধ্যে মূল যে বিষয় তা হচ্ছে, বাংলাদেশের সংবিধানে সাধারণ মানুষের যে অধিকার আছে, জনগণ কোনো ধরনের বাধা-বিপত্তি ছাড়া তাদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে পারবে- এ অধিকার নিশ্চিত করার জন্যই আমাদের এই সংস্কার প্রস্তাব। জনগণের প্রতিনিধিরাই তো সংসদে বসেন। তাই জনগণের ভোটাধিকারের মৌলিক দাবির কথা এ সংস্কার প্রস্তাবে তুলে ধলা হয়েছে। সরকার জনগণের মৌলিক দাবির কথা যদি আমলে না আনে তাহলে পদত্যাগ ছাড়া আর কী করার আছে?

২০০০ : লংমার্চ শেষে সমাবেশ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি হরতালের ঘোষণা দিয়েছেন। হরতালের রাজনীতি এ দেশের মানুষ পছন্দ করে না। বিষয়টি আপনারা কীভাবে দেখছেন?

সাবের : আমরা এটা উপলব্ধি করেছি, হরতালে দেশের ক্ষতি হয়। মানুষের নানা সমস্যা হয়। তবে দেখুন, হরতাল মূল বিষয় নয়। মূল বিষয় হচ্ছে, গণতন্ত্রে ভিন্নমত প্রকাশ করার যে অধিকার, এটা হচ্ছে তার অন্যতম একটি উপায়। সরকার যেভাবে দেশ পরিচালনা করছে তা যদি আমার পছন্দ না হয় তবে সেটা ব্যক্ত করতে পারব। সরকার শান্তিপূর্ণ যেকোনো কর্মসূচিতে আমাদের হাজার হাজার নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে। আমাদের মত প্রকাশের বা প্রতিবাদ করার জন্য সামনে একটা পথ খোলা থাকা প্রয়োজন। সরকার যদি সব পথ অবরুদ্ধ করে দেয়, ভিন্নমত প্রকাশ করার সুযোগ না দেয় তাহলে হরতাল ডাকা ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় থাকে না।

২০০০ : লংমার্চকে ঘিরে ষাটের দশকের ছাত্রনেতারা সক্রিয় ছিলেন। সে তুলনায় আওয়ামী লীগের নবীন ও উদীয়মান নেতারা নিষ্প্রভ ছিলেন বলে জনশ্রুতি আছে। এর পেছনে কী কারণ রয়েছে বলে মনে করেন?

সাবের : নবীন নেতারা নিষ্প্রভ ছিল- এটা আমার জানা নেই। লংমার্চ ঘিরে আমাদের ৬টি রুট ছিল। আমি ৫ নম্বর রুটে ছিলাম, যেটা ময়মনসিংহ থেকে এসেছে। নবীন ও উদীয়মান নেতাদের বিভিন্ন রুটে ভাগ করে দেয়া হয়েছিল। আমার রুটে যাদের দায়িত্ব ছিল, তাদের সবাইকে পেয়েছি। ঢাকার প্রবেশদ্বার চারটি থানায় চার উদীয়মান নেতা নসরুল হামিদ বিপু, মুরাদ জং, জাহিদ আহসান রাসেল ও কায়সার হাসনাত তাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করেছেন। আপনারা জানেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতাদের সারা দেশে বিশাল পরিচিতি ও জনপ্রিয়তা রয়েছে। লংমার্চে কর্মীরা তাদের কাছাকাছি যাবার চেষ্টা করেছে।

২০০০ : রাজপথের আন্দোলন দানা বেঁধে না ওঠার পেছনে কী কারণ রয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

সাবের : রাজপথের আন্দোলন দানা বেঁধে উঠছে না, একথা ঠিক নয়। সরকার বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের ওপর যেভাবে অত্যাচারের স্টিমরোলার চালিয়েছে, তা অতীতের সব রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। তবে আমি যেটা মনে করি, বিগত তিন বছরে যা করা যায়নি, এখন তা শুরু হয়েছে। এতে আমরা বেশ আশাবাদী। কারণ কর্মীরা নির্মম অত্যাচারের শিকার হয়েও যেভাবে রুখে দাঁড়িয়েছে, তা আগামীতে ধাপে ধাপে নতুন গতি সঞ্চার করবে।

২০০০ : আগামী নির্বাচনে দলের ত্যাগী এবং তরুণ নেতাদের কতটুকু মূল্যায়ন করা হবে বলে মনে করেন?

সাবের : নির্বাচনের প্রক্রিয়াটা ভিন্ন। আমি যদি একজনকে মূল্যায়ন করতে চাই তাহলে নির্বাচনের বাইরে অন্যভাবেও করতে পারি। নির্বাচন হচ্ছে একটা বিশেষ ধরনের লড়াই। এ লড়াইয়ে কে বিজয়ী হবে, কীভাবে বিজয়ী হবে তা পর্যালোচনা করা হচ্ছে। প্রার্থী হিসেবে যাদের মাঠে গ্রহণযোগ্যতা থাকবে না, তাদের প্রার্থী করা হবে না। অর্থাৎ আওয়ামী লীগ আত্মঘাতী কোনো সিদ্ধান্ত নেবে না। প্রার্থী হিসেবে যার বিজয়ী হবার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বল তাকেই মনোনয়ন দেয়া হবে। এ ক্ষেত্রে কে বর্তমান এমপি তা বড় ব্যাপার নয়। তবে দল ক্ষমতায় এলে দলের ত্যাগী নেতাদের তাদের স্বীয় অবদানের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হবে।

২০০০ : আপনারা বলেছেন, বর্তমান সংসদে ১১০ জন গডফাদার ও কালোবাজারি রয়েছে। সন্ত্রাসের অভিযোগ তো আপনাদের বিরুদ্ধেও ছিল। আগামীতে আপনারা ক্ষমতায় গেলে একই ধরনের গডফাদাররা কি প্রশ্রয় পাবে?

সাবের : দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাংলাদেশের রাজনীতির প্রায় সব ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ ও বিএনপিকে একই সঙ্গে তুলনা করা হয়। আপনি যে প্রশ্নটি করলেন আমাদের সময় গডফাদার ছিল। হ্যাঁ, আমাদের সময় হাতেগোনা ৪-৫ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল। আর বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সময় এখন পুরো বাংলাদেশেই গডফাদার আছে। তাদের আশ্রয়ে-প্রশ্রয়ে ৩০০টি নির্বাচনী এলাকায় ৩০০ জন গডফাদার জন্ম নিয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে বহুসংখ্যক মাস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং আওয়ামী লীগের সঙ্গে বিএনপির তুলনা করা ঠিক হবে না। আমরা বিএনপির সঙ্গে নিজেদের তুলনা করি না। কারণ আমাদের নিজস্ব কিছু স্ট্যান্ডার্ড আছে। '৯৬-২০০১ আমরা যখন ক্ষমতায় ছিলাম, তখন আমাদের সব কাজ সঠিক ছিল সেটা বলব না। আমাদের কিছু কিছু জায়গায় ঘাটতি ছিল। আগামী নির্বাচনে আমরা জয়ী হলে, সরকার গঠন করলে যাতে আর সন্ত্রাসী গডফাদার তৈরি না হয় সে ব্যাপারে যথেষ্ট সজাগ থাকব।

> সরকার শান্তিপূর্ণ যেকোনো কর্মসূচিতে আমাদের হাজার হাজার নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে। আমাদের মত প্রকাশের বা প্রতিবাদ করার জন্য সামনে একটা পথ খোলা থাকা প্রয়োজন। সরকার যদি সব পথ অবরুদ্ধ করে দেয়, ভিন্নমত প্রকাশ করার সুযোগ না দেয় তাহলে হরতাল ডাকা ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় থাকে না

২০০০ : আগামী নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হলে বিজয়ের ব্যাপারে আপনারা কতটুকু আশাবাদী?

সাবের : আগামী নির্বাচনে আমরা বিজয়ী হচ্ছি কি না এটা বড় বিষয় নয়। বিষয়টি হচ্ছে, জনগণ বিজয়ী হতে পারছে কি না। জনগণ তাদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে পারছে কি না। জনগণ যদি বিজয়ী হয় তবে নিশ্চয় সেই বিজয়ের ধারাবাহিকতায় আওয়ামী লীগও বিজয়ী হবে ইনশাল্লাহ। এ এ ব্যাপারে আমি খুবই আশাবাদী।

২০০০ : আপনি বর্তমানে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও বিরোধীদলীয় নেত্রীর রাজনৈতিক সচিবের দায়িত্ব পালন করছেন। দুটি পদের কোনটি গুরুত্বপূর্ণ এবং কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন?

সাবের : দুটি দায়িত্ব এক নয়, এখানে অনেক ভিন্নতা আছে। দুটির সম্পর্ক ভিন্ন, চাহিদা ভিন্ন, প্রেক্ষাপট ভিন্ন। রাজনৈতিক সচিব হিসেবে আমি একজনের (দলীয় সভানেত্রী) সঙ্গে, একজনের পক্ষে কাজ করি। আবার সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে সারা বাংলাদেশের দায়িত্ব পালন করি। এখানে সমন্বয়ের যথেষ্ট সুযোগ আছে। এখানে আমার ব্যক্তিগত পছন্দ নেই। আমার মূল চিন্তা হচ্ছে, আমি এখানে কতটুকু স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করলাম সেটা বিষয় নয়, আমি দলকে কতটুকু দিতে পারলাম সেটাই বড় বিষয়।

২০০০ : সম্প্রতি জেএমবি ক্যাডাররা স্বীকারোক্তি দিয়েছে, জঙ্গি হামলায় আওয়ামী লীগের ইন্ধন রয়েছে। বিষয়টি কতটুকু সত্য?

সাবের : সরকার ও বিরোধী দল দুটি ভিন্ন অবস্থানে রয়েছে। সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে কোনো ঘটনা ঘটলে তার স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ তদন্ত করা। যারা প্রকৃত অপরাধী তাদের খুঁজে বের করা। সাবেক অর্থমন্ত্রী কিবরিয়া ও সাংসদ আহসানউল্লাহ মাস্টারসহ মমতাজ ও মঞ্জুরুল ইসলামের হত্যাকাণ্ড- সব ঘটনাতেই তারা প্রথমে আওয়ামী লীগকে জড়াতে চেয়েছে। কোনোটাতেই সঠিক তদন্ত করেনি। আমরা যেটা বলি, সরকার জড়িত, তার পেছনে অকাট্য যুক্তি রয়েছে। যেহেতু সরকার কোনো তদন্ত করে সঠিক তথ্য বের করছে না, সে ক্ষেত্রে দায়দায়িত্ব তাদের কাঁধেই পড়ে এবং জনগণও এটা বিশ্বাস করে। আজকে এটা বাংলাদেশের জনগণের কাছে স্পষ্ট, কারা এই বোমা হামলার সঙ্গে জড়িত। কারা জঙ্গিদের মদদদাতা আর এসব ঘটনার সঙ্গে কাদের সম্পৃক্ততা রয়েছে। কাজেই বিরোধী দলকে দায়ী করার যে অপচেষ্টা তারা করছে তা কোনো দিনই সফল হবে না।

২০০০ : জঙ্গি তৎপরতার সঙ্গে মূলত কারা জড়িত বলে মনে করেন?

সাবের : আমার মনে হয়, সরকারের সর্বোচ্চ মহলের ইঙ্গিত ছাড়া এ ধরনের তৎপরতা চালানো সম্ভব নয়। জামায়াতের জঙ্গি কানেকশন আজ প্রতিষ্ঠিত সত্য। যারা জামায়াতকে উৎসাহিত করছে তারা সরকারের ভেতরেই আছে। আমি মনে করি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ হাওয়া ভবন ও তারেক জিয়া সরাসরি এতে জড়িত। তাদের গ্রিন সিগন্যাল ছাড়া বাংলাদেশে এভাবে একের পর এক ঘটনা ঘটতে পারে না। তারা বিষয়টি নিশ্চয়ই জানে। এমনও হতে পারে, তাদের সঙ্গে সমন্বয় করেই এ ঘটনার জন্ম দেয়া হয়েছে।

২০০০ : বিগত প্রায় ৫ বছর আপনারা বিরোধী দলে আছেন। সে ক্ষেত্রে বিরোধীদলীয় নেত্রীর নেতৃত্বকে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করছেন?

সাবের : গত ৫ বছর নয়, পঁচাত্তরের পরবর্তী সময়ের দিকে যদি তাকাই তাহলে আমি দেখব আশির দশকে শেখ হাসিনা দেশে এসে নেতৃত্ব দেয়ার পর থেকে আওয়ামী লীগ অনেক এগিয়েছে। আশির দশকের পর আওয়ামী লীগ যতগুলো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে, প্রত্যেকটি নির্বাচনে প্রচুর ভোট বেড়েছে। এই ভোট বৃদ্ধি পাওয়া বা সমর্থন পাওয়ার বিষয়টি কেউ বলে না। ২০০১-এর সর্বশেষ নির্বাচনে কারচুপির মাধ্যমে আমাদের পরাজিত করা হলেও সেই নির্বাচনেও আমাদের ভোটের পরিমাণ বেড়েছে ৪%। আশির দশকে আওয়ামী লীগের জনসমর্থন ছিল ২১ বা ২২ শতাংশ। ২০০১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৪১ শতাংশ হয়েছে। এই যে ধাপে ধাপে সমর্থন বৃদ্ধি, এর মূল কারিগর জননেত্রী শেখ হাসিনা। একজন নেতা বা নেত্রীর নেতৃত্বের সফলতা নির্ভর করে জনসমর্থনের ওপর। প্রতিটি নির্বাচনে তার নেতৃত্বে যেহেতু জনসমর্থন পড়ছে অতএব তিনি সফল- এ কথা আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি। তিনি দেশে ফিরে আসার পর এ পর্যন্ত ১৮ বার তার প্রাণনাশের চেষ্টা করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও তিনি যেভাবে গতিশীল নেতৃত্বের মাধ্যমে দলকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসাযোগ্য।